তৃতীয় অধ্যায়

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পরিবেশ চেতনার প্রতিফলন

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, কেননা মানুষ অরণ্যবাসী ছিল, গুহাবাসী ছিল অর্থাৎ মানুষ যখন থেকে একেবারে লগ্ন আকাশের নীচে বাস করতো এবং তারপর যখন গুহাজীবন শুরু হয় তখন থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে নগ্ন হয়ে থেকেছে। যখনই মানুষ সভ্যতার নামে, সংস্কৃতির নামে, বিস্তারের নামে প্রকৃতিকে ধ্বংস করেছে এবং ক্রমে ক্রমে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তবে থেকে তার জীবনে এবং মনে নানা ধরনের কু-রোগ বাসা বেঁধেছে। দেখা দিয়েছে অস্তিত্বের তীব্র সংকট। আসলে প্রকৃতির সংলগ্নতাই হচ্ছে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অন্যতম চাবিকাঠি। ফলে নদী, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ যখন ক্রমশ শহুরে এবং ঘরবন্দি হলো, তখন তারা প্রকৃতির সঙ্গে সংলগ্নতা হারাল। এই সংলগ্নতা হারানোটাই হচ্ছে একটা বড়ো অভিশাপ, যার ফলে মানব সভ্যতা ক্রমশ পীড়িত, ক্রমশ অসুস্থ ও অসুখময় হয়ে উঠেছে; যেখানে মৃত্যু আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে মৃত্যু আমাদের ভোর এবং রাত্রি দুটোকেই প্রায় নিয়ন্ত্রণ করছে। এই যে মানুষের প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তা অনেকটা যেন মায়ের কোল থেকে ছিটকে গিয়ে কোনো একটা ঘাতক দোলনার ওপর শুয়ে পড়া। প্রকৃতির সঙ্গে আজ মানুষের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন বলেই আমাদের জীবনে এসেছে অনেক ধরনের সংকট। সেই সংকট সভ্যতার অংশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে আমাদের সামনে। আমরা দেখতে পাচ্ছি অরণ্য ধ্বংস করে, নদী বুজিয়ে, সমুদ্রকে দূষিত করে, জল নষ্ট করে, সমস্ত সবুজকে ধ্বংস করে মানুষ নিজের সমাধি নিজে খুঁড়েছে। মানুষের তথাকথিত দখল অভিযান 'জয়'-এর নামে কখনো হিমালয়, কখনো উত্তর মেরু, কখনো দক্ষিণ মেরু, কখনো গহীন অরণ্য, কখনো সমুদ্র প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে প্রায় ধ্বংস করেছে। সভ্যতার কালি মেখেছে আকাশ, গ্রাস করেছে অরণ্য। তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে—আমাদের ভারতীয় জীবনের প্রাচীন যে গ্রন্থগুলি আছে, তার মধ্যে কিন্তু প্রকৃতি চৈতন্যের কথা মন্ত্র হিসেবে এসেছে। সেখানে নদী, পুষ্করিণী, সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য, প্রস্তর প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই বন্দনা করা হয়েছে নানারকম ভাবে এবং প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকরাও মনে করেছিলেন যে, প্রকৃতি এবং পরিবেশ যদি বিশুদ্ধ না থাকে তাহলে সমস্ত সভ্যতাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অকারণ বন্যা ও অগ্নুৎপাত দেখা দেবে। কিন্তু

পরবর্তী সময়ে যখন মানুষের চিন্তা এবং চৈতন্য আরও বিকশিত হলো তখনো মানুষ সভ্যতা নিয়ে খুব একটা ভাবেনি। কৃষি জমির সর্বনাশ করে গড়ে তোলা হয়েছে শিল্প। এই প্রবণতা ক্রমশই নিয়ন্ত্রণহীন স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হয়েছে। উন্নয়নী প্রচেষ্টার সঙ্গে এইভাবে যুক্ত হয়ে গেছে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিপত্তিশীল শ্রেণির মুনাফালিপ্সা। আর কেনা জানে ক্ষমতার অন্যান্য ইনস্টিটিউশনগুলি আসলে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী প্রভুদেরই হাতের পুতুল! তাই পরিবেশের সর্বনাশ রাষ্ট্র দেখেও দেখে না। পুলিশ, রাজনৈতিক দল এসব উপেক্ষার নজরে দেখে। তাই মেধা পাটেকরদের আন্দোলনকে পাত্তা না দিয়ে নর্দমা নদীর উপর বাঁধ নির্মিত হয়, প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করে নেওয়া হয় সকল নদী একসূত্রে গ্রথিত করবার নির্বোধ সিদ্ধান্ত। নির্বিচারে স্যালো পাম্প বসিয়ে সবুজ বিপ্লব ঘটানোর স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আর্সেনিক দৈত্যকে সাদরে আহ্বান জানানো হয়। কারখানা তৈরি হয় পরিবেশ আইনকে তুচ্ছ করে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেও কোনো ফল মেলে না। কেননা লগ্নিপুঁজির কাছে ক্ষমতার সকল উপকেন্দ্রগুলি যে স্বার্থের বাঁধনে বাঁধা! তবুও প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই গোটা বিশ্বজুড়ে বৃহৎ শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ যে নানাভাবে দূষিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে—বিজ্ঞানীরা তা অনুমান করতে পেরেছিলেন। এই যে পরিবেশের পরিবর্তন তা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবনের উপর যে প্রভাব ফেলে তাতে পরিবেশের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য প্রবল ভাবে নষ্ট হয়। আর বিচ্যুত ভারসাম্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঠিক ভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তবে মানুষের ক্ষেত্রে পরিবেশ তো শুধুমাত্র ভৌত পরিবেশ নয়, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান, রুচি বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তার সামগ্রিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পরিবেশ নিয়ে সর্বপ্রথম জাতিসংঘ পরিচালিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে। আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিবেশ দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ ভাবনা শুরু হয় এখান থেকেই। আমাদের ভারতবর্ষও এই সম্মেলনের অংশীদার ছিল। ১৯৭৩ সালে এই লক্ষকে পূরণ করার জন্য তৈরি করা হয় U. N. E. P. অর্থাৎ 'United Nations Environment Programme'। এর পরিপ্রেক্ষিতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজেদের মতো করে তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষে ১৯৭৩ সালে উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়ালে সংঘটিত হয়েছিল চিপকো আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য ছিল অরণ্য রক্ষা এবং এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

চণ্ডীপ্রসাদ ভাট ও সুন্দরলাল বহুগুণা। এরপর ১৯৭৪ সালে ভারতবর্ষে প্রথম প্রণীত হয় দূষণ সংক্রান্ত জল আইন। ১৯৮১ সালে তৈরি হয় বায়ু দূষণ সংক্রান্ত আইন, ১৯৮৬ সালে তৈরি হয় পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন। ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে ১৯৯২ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল—বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার জন্য সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্মেলন—যা 'বসুন্ধরা শীর্ষ সম্মেলন' (Earth Summit) নামে পরিচিত। এইসব কিছুর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটাই—পৃথিবীকে দূষণ মুক্ত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য করে তোলা। এইসব সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির পাশাপাশি কলম হাতে নিয়ে হেঁটেছেন সংবেদনশীল কবি-সাহিত্যিকরাও। তবে শিল্পী-সাহিত্যিকরা কিন্তু এই আইনের অপেক্ষায় বসে থাকেননি। বিপন্ন বসুন্ধরাকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা কলম ধরেছিলেন অনেক আগেই। পরবর্তীতে যা সচেতন প্রয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। পরিবেশবাদী ভাবনার সাহিত্য ইউরোপ ভূ-খণ্ডেই নাকি প্রথম গড়ে ওঠে। অনেকে র‍্যাচেন কার্সনের 'Silent Spring'-কে এ জাতীয় রচনার আদি বলে গণ্য করেন। বইটির মূল বিষয় হলো—রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে অজৈব সার, আগাছা ও কীট্‌পতঙ্গকে দমন করার জন্য বিভিন্ন পেস্টিসাইড কীভাবে আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। এরপরে একে একে পল এলব্রিখ, সি. জে. গ্লাকেন, ব্যারি কমনারের মতো লেখকরাও পরিবেশ সচেতনতামূলক সাহিত্য রচনা করেছেন। এইসব রচনাকে 'ইকো-টেক্সট'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বাংলা ভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি 'সবুজায়নের সাহিত্য'। গত শতাব্দীর সাত ও আটের দশক থেকে পশ্চিমী গবেষকরা চেষ্টা করেছিলেন এই ধরনের 'সবুজায়নের সাহিত্য'-গুলিকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ডে ব্যবহার করতে। সমালোচনার এই তত্ত্বকে তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন 'Eco-Criticism' নামে। অবশ্য নয়ের দশক থেকেই সাহিত্য সমালোচনায় পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা ঘটেছিল এবং এর শুভারম্ভ করেছিলেন অধ্যাপক Cheryll Glotfelty। Cheryll Glofelty এবং Harold Fromm 'Eco-Criticism' সংক্রান্ত যাবতীয় লেখাগুলিকে একত্রিত করে ১৯৯৬ সালে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন—বইটির নাম 'The Eco-Criticism Reader : Land Marks in Literary Ecology'। সাহিত্যিকরা সমাজে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ। তাই তাঁদের মনের তন্ত্রীতে পরিবেশ ধ্বংসের আঘাত লেগেছে ক্রমাগত। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন সমস্ত মানব সভ্যতা এখন ক্রমশ এক অন্ধকার অস্তিত্বের দিকে

এগিয়ে চলেছে। তাদের এই অনুভূতিই রূপ পাচ্ছে বিচিত্র সাহিত্য সংরূপে। এ ধরনের সাহিত্যকে আলাদা একটা দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যই আবির্ভূত হয়েছে এই 'Eco-Criticism' তত্ত্ব। সনৎকুমার নস্কর 'ইকো-ক্রিটিসিজম্ : তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ও কয়েকটি বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধে সম্ভাব্য বিতর্কের অবকাশ রেখেই পরিবেশমূলক তত্ত্বকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন—

ক. বিশুদ্ধ নিসর্গ চিত্র।

খ. প্রকৃতি প্রেমের সাহিত্য।

গ. পরিবেশ বিভাবিত রচনা। এবং

ঘ. পরিবেশবাদী সাহিত্য।

অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাসে যে সময় পর্বকে প্রাগাধুনিক বলে গণ্য করা হয়েছে, মানে সেই চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সাহিত্য ধারায় পদ্যে যা যা লেখা হয়েছে তাতে বর্তমান কালের পরিবেশ বিষয়ক ভাবনার কোনো ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। তার পরিবর্তে সেখানে আছে নিসর্গ প্রকৃতি, আর তার বর্ণাঢ্য রূপ চিত্রণ। ইংরেজিতে যাকে বলা হয়ে থাকে Nature Writing। চর্যাপদের যে আরণ্যক পরিবেশ, বৈষ্ণব পদে যে প্রতিকূল প্রকৃতি কিংবা মঙ্গল কাব্যের বারোমাস্যায় যে ষড় ঋতুর যে স্বভাবী বর্ণনা আছে, তা শুধুমাত্র প্রকৃতি চিত্রণের অঙ্গ রূপে দেখা দিয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকে এসে পূর্বের এই কাব্য-কবিতার ধারার একটা আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। কারণ এই সময়েই আমাদের সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে পশ্চিমী রেনেসাঁসের প্রবল প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। আর এই পথ ধরেই বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হলো রোমান্টিসিজম্। যা এক ধরনের বিশেষ কবি মনোবৃত্তি। উনিশ ও বিশ শতকের কোনো কোনো কাব্যকার রোমান্টিকতার মেদুর আলোকে দেখলেন প্রকৃতিকে, নারীকে ও স্বদেশকে। সেজন্যই তখন প্রকৃতি আর কেবল বাহ্যিক ব্যাপার হয়ে রইলো না, হয়ে উঠলো অন্তরের বস্তু। প্রকৃতিকে ঘিরে কবি হৃদয়ে জন্ম নিলো প্রকৃতি প্রেম। উনিশ শতকেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যে সৌন্দর্য পিপাসা লক্ষ করি, তার একটা আশ্রয় ছিল এই প্রকৃতি। এর সূচনা ধরা যেতে পারে বিহারীলাল থেকে এবং সমাপ্তি প্রায় রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের লেখনীর মধ্য দিয়ে। আসলে তাঁরা যে সময়কার পৃথিবীতে আজকের মতো এতটা দূষণ ছিল না এবং তৎকালীন যন্ত্র সভ্যতা বর্তমান সময়ের মতো ভয়ংকর দাঁত নখ বিস্তার করে তাদের সত্তাকে গিলে খেতে আসেনি। পরিবেশ দূষণ তখনো নিশ্চই ছিল কিন্তু জনসংখ্যার

অনুপাতে তা এতটাই অল্প যে তাকে সহজে ঠাহর করা যেত না। এবারে দেখে নেওয়া যাক পরিবেশ বিভাবিত রচনা সম্পর্কে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশবাদী আন্দোলন গড়ে উঠবার আগের পর্যায়ে এ ধরনের রচনার জন্ম। অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ছয়ের দশক পর্যন্ত মোটামুটি পঞ্চাশ বছরকে পরিবেশ বিভাবিত রচনার কাল হিসেবে গণ্য করা যায়। এই সময় পর্বে দুজন বাঙালি সাহিত্যিকের প্রকৃতি ভাবনার অভিনবত্ব আমাদের সন্ধানের দৃষ্টিকে ব্যাপক ভাবে আকর্ষণ করে। প্রথম জন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিতীয় জন হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা পৃথিবীতে যখন প্রকৃতি ও পরিবেশের সংকট নিয়ে কেউ কোথাও তেমন কিছু ভাবছেন না, তখন বিশ্ব চৈতন্যের অতন্দ্র প্রহরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধীরে ধীরে টের পাচ্ছেন আগামী কোনো অশনি সংকেতের। সেকারণেই হয়তো তিনি বর্ষামঙ্গল ও হলকর্ষণ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি শুরু করেছিলেন বৃক্ষরোপণ উৎসব। প্রকৃতির প্রতি মানুষের অসংযত আচরণের কথা খোলাখুলি ভাবে লিখলেন ‘অরণ্য দেবতা’-তে। পাশাপাশি ‘বনবাণী’-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজের সত্তার সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কটি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতি বিমুগ্ধ কবি তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকা গাছপালাকে দেখেন ‘বিশ্ব বাউলের এক তারা’ রূপে। তাই কবি প্রতি প্রভাতে, প্রতি নিস্তব্ধ রাতে তারার আলোয় বৃক্ষ দেবতার উদ্দেশ্যে উদগীত ওঙ্কারের সঙ্গে নিজের ধ্যানের সুরকে মেলাতে চান। সেই দেবতার বন্দনা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ধ্যান গম্ভীর কবির ছন্দময় এই স্তবে—

“মৃত্তিকার হে বীর সন্তান
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র—ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়;
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয় – আখ্যানলিপি লিখে দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ; চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।”[১]

এর থেকে স্পষ্ট বৃক্ষ দেবতার এই সদর্থক ভূমিকার বিপরীতেই রয়েছে নঞর্থক ধ্বংসের ইঙ্গিত। অপরদিকে বাংলা সাহিত্যে কল্লোল পরবর্তী এক উল্লেখযোগ্য কথাকার হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিশিষ্টতা কথাসাহিত্যে নিসর্গ প্রকৃতির অপূর্ব কাব্যময় ব্যবহারে। সত্যি কথা বলতে তাঁর আগে বাংলা উপন্যাসে এমন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রকৃতিকে এতবড়ো ভূমিকায় দাঁড় করাবার দুঃসাহস আর কেউ দেখানোর চেষ্টা করেননি। প্রকৃতির মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন অপরিমেয় কবিত্ব ও গভীর দার্শনিকতা। তবে প্রকৃতি মুগ্ধ ভাবুক থেকে পরিপূর্ণ পরিবেশবাদী লেখক হিসেবে তাঁকে হয়তো উঠে আসতে দেখিনি। কিন্তু তাঁর আরণ্যক যে পরিবেশ বিভাবিত একটি বিশিষ্ট রচনা এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ যে কিনা নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত। সে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার লবটুলিয়া-বইহার-আজমাবাদের নির্জন নিবিড় অরণ্যে জঙ্গলমহলের ম্যানেজারের পোস্টে জয়েন করে এবং তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ঘন বন হাসিল করে প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘা জমিতে প্রজা বসানোর। সময়ের আবর্তনে ধীরে ধীরে এখানকার শ্যামল প্রকৃতি, বন-জঙ্গল, দেহাতী মানুষজন তার নাগরিক সত্ত্বাকে গ্রাস করে নেয়। ধীরে ধীরে অনুভব করতে থাকে প্রকৃতির অনুরূপ সৌন্দর্যকে। কিন্তু তার হাত দিয়েই অরণ্য ধ্বংস হয়ে গেল। উপন্যাসের শেষে সত্যচরণ যেন বোবা হয়ে যায় নিজের এই কার্যকলাপে কারণ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা আরণ্যক পরিবেশকে সে দু-হাতে গলা টিপে মেরেছে। তাই লবটুলিয়া থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে বুক ভাঙা একরাশ কষ্ট অনুভব করে সত্যচরণ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে বোবা অরণ্য দেবতার কাছে। অপরদিকে, উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র যুগল প্রসাদ নিজের ইচ্ছায় সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে অসংখ্য গাছ লাগিয়ে যায় নীরবে। বনসৃজনের এই অভিনব পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বৃক্ষরোপণ উৎসবকে মনে করিয়ে দেয়। সবমিলিয়ে, 'আরণ্যক' প্রকৃতির নিছক সৌন্দর্য বিলাসের মনোরম লিপি চিত্র হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে প্রকাশ ঘটে ভাবুক বিভূতিভূষণের পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্ক কেন্দ্রিক বলিষ্ঠ চেতনার।

পরিবেশ দূষণের সম্ভাব্য সংকেত নিয়ে ভারতে সরকারি স্তরে প্রথম সচেতনতা গড়ে উঠতে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে। পরিবেশবাদী রচনাও সেসময় থেকেই অল্পবিস্তর ভারতীয় সাহিত্যে প্রকাশ পেতে থাকে। পঞ্চাশ-ষাট দশকের বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত প্রচলিত ধারা তখন নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে। সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া রাজনীতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নস্যাৎ

করে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন তখন বিপুল আবেগের শক্তি নিয়ে বাস্তবের ভূমিতে সাকার হওয়ার জন্য প্রবল সক্রিয়। অলিগলিতে শোনা যাচ্ছিল বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ। এই বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে নতুন আঙ্গিক, নতুন বিষয় ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য রচনা ছিল সে সময়ের দাবি। এই দাবিকে প্রথম সম্মান জানিয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী এবং বাংলা ভাষায় প্রকৃতি চর্চা, পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশ দূষণ, পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন ও গ্রীন হাউস এফেক্ট—এই সমস্ত কিছুকে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে প্রথম স্পষ্ট ভাষায় যিনি উপন্যাস লেখেন তিনি হলেন কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায়। কিন্নর রায় আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে 'প্রকৃতিপাঠ' (১৯৯০) নামে একটি আখ্যান নির্মাণ করেন। প্রকৃতি এখানে পটভূমি নয়, তা বিষয় হয়ে উঠেছে এবং বিপন্ন প্রকৃতির সবকটি স্তর লেখক তুলে ধরেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। তিনি এই আখ্যানে দেখিয়েছেন, কীভাবে জলের স্তর নামিয়ে দিচ্ছে বহুতল বাড়ি, বেআইনি কনস্ট্রাকশন ভেঙে পড়ে মৃত্যু হচ্ছে শত শত মানুষের এবং শাল গাছ কেটে স্বাভাবিক অরণ্য ধ্বংস করে মানুষ এখন তার সুবিধে মতো লাগাচ্ছে ইউক্যালিপটাস যা বনভূমির জলের স্তর নামিয়ে দিচ্ছে। লেখক স্পষ্ট করে বলেছেন—এই সমস্ত গাছ কখনোই দেশজ গাছের পরিপূরক হতে পারে না। সেকারণেই শীত এলে ধোঁয়া মেশা কুয়াশার ভারী পর্দা ঝুলে থাকে কলকাতার আকাশে। হাজার হাজার উনুনের ধোঁয়া ও মাইকের চিৎকারে হওয়া পচে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং ফুসফুসে চাপ পড়ে। কিন্নর রায় তাঁর 'প্রকৃতিপাঠ' উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানবিকতার সম্পর্ককে বার বার দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

কিন্নর রায়ের 'প্রকৃতিপাঠ'-এর পর যথার্থ পরিবেশকেন্দ্রিক উপন্যাস সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির'—যা ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত। আমার তৃতীয় অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় হলো 'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পরিবেশ চেতনার প্রতিফলন'। সত্তর দশকের অন্যতম কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পরিবেশকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত প্রাণবন্ত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর একের পর এক উপন্যাস ও ছোটোগল্প তিনি উন্মোচিত করেছেন পরিবেশ ও লগ্নিপুঁজির বিপরীত মেরুর সম্পর্ক, স্পষ্ট করেছেন তথাকথিত উন্নয়নী যজ্ঞের আসল রূপ। ব্যক্ত করেছেন লগ্নিপুঁজি ও ক্ষমতাতন্ত্রের বিভিন্ন উপকেন্দ্রগুলির স্বার্থঘন সম্পর্ক এবং এসবের চাপে পিষ্ট ব্যক্তি মানুষের সকরুণ পরিণতি। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবেশ চেতনার কথা বলতে গেলে যে কটি

উপন্যাসের কথা আমাদের মনে আসে সেগুলি হলো—'জলতিমির', 'শেষ রাতের শেয়াল', 'বিন্দু থেকে বৃত্তে', 'পানিহাটা' এবং 'গহিন গাঙ'।

'জলতিমির' উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য বিষয় জলদূষণ এবং প্রেক্ষাপট গ্রাম বাংলা। আমরা সকলেই জানি বহুদিন ধরেই জলে আর্সেনিক দূষণ সমাজের গরিব শ্রেণির মানুষের জীবনে এক সন্ত্রাস। আজ সে দূষণ প্রচণ্ড বেড়েছে। বিশেষ করে খরা, বন্যা, সাইক্লোন, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দেশি-বিদেশি নানারকম শোষণ ও অত্যাচারের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঙালি আজও টিকে আছে। স্বাধীনতার পর ভালোভাবে বাঁচবার আশায় তারা কিছুটা এগিয়েও ছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত এক দুর্ভাগ্য ছদ্মবেশে তাকে আজ এক জীবন-মরণ সংকটে ফেলে দিয়েছে। যে জলেতে প্রাণ বাঁচে, সেই জলই গোপনে মৃত্যুকে বক্ষে ধারণ করে নির্মল শীতল পানীয় জলরূপে বাঙালিকে সংহার করে চলেছে। দেহে একবার প্রবিষ্ট 70 থেকে 180 মিলিগ্রাম মতো আর্সেনিক যেখানে প্রাণঘাতী, সেখানে টন টন আর্সেনিক জলবাহিত হয়ে ভূগর্ভ থেকে উঠে বাংলার মানুষসহ সকল জীবজন্তু, কৃষিখেতে ছড়িয়ে জীবজগত ও সমগ্র পরিবেশকেই বিষাক্ত করে তুলছে। অনিবারিত আর্সেনিক দূষিত এই ভূগর্ভ জলোত্তোলন যত চলবে, বাংলা ও বাঙালি জাতিকে বাঁচানো ততো বেশি কঠিন হয়ে পড়বে। কম করে হলেও আজ পশ্চিমবঙ্গে অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ, আর বাংলাদেশে অন্তত সাড়ে তিন কোটি মানুষ পঞ্চাশ পিপিবি-র বেশি মাত্রার আর্সেনিক দূষিত জল পান করছেন। তাতে প্রতি একশ জনে অন্তত এক জনের মূত্রাশয় বা ফুসফুসের মারাত্মক ক্যানসার হবেই। আর্সেনিক ঘটিত ক্যানসারের সুপ্তাবস্থা প্রায় দশ বছর। সুতরাং আগামী দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ক্যানসারের যে মহামারী হবে, তাতে পশ্চিমবঙ্গে বছরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার, আর বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ অতিরিক্ত মারাত্মক ক্যানসার হবেই। বাংলাদেশে এখনই প্রতি পনেরো মিনিটে একজন আর্সেনিক ঘটিত ক্যানসারে মারা যাচ্ছে। আগামী দশ বছরে দুই বাংলায় চিকিৎসকদের আর্সেনিক ঘটিত নানারকম অসুখ-বিসুখের মোকাবিলা করতেই হবে, যা এইডস্ মহামারী থেকে বেশি ভয়াবহ হবে। মাতৃগর্ভে বহু শিশুর জন্মের আগেই মৃত্যু হবে; অনেক নবজাতক জন্মগত নানা বিকৃতি নিয়ে জন্মাবে; এবং অনেকেরই বুদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হবে। জনস্বাস্থ্য ও খাদ্য-সংস্থানের জন্য যে কৃষিবিপ্লব ও ভূগর্ভ জলোত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আক্ষরিক অর্থেই তা পরিবেশে বিষবিপ্লব ঘটাল। জলবাহিত আর্সেনিকের সাথে আরও যুক্ত হচ্ছে কয়লা জ্বালানির ফলে উদ্ভূত

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্গত আর্সেনিক, মার্কারি, লেড ও অন্যান্য বিষাক্ত ধাতু সমূহ এবং তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম। একটা মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ থেকে প্রতি বছর প্রায় আটশো টন আর্সেনিক ও তেইশ টন মার্কারি পরিবেশের জল, মাটি, বাতাস ও ইকোসিস্টেমের উপর বিষক্রিয়া করছে।

পৃথিবীর সব দেশেই কমবেশি আর্সেনিক দূষণ ছিল, এখনো আছে; তাদের ইতিহাস অনুধাবনীয়। কিন্তু এশিয়ার বড়ো বড়ো নদীর সুজলা-সুফলা পলল ভূমিতে, যেখানে সবচেয়ে বেশি লোকের বাস, সেই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা, ইরাবতী, মেকং, লোহিত নদীর পলল ভূমির ভূগর্ভস্থ জলেই আর্সেনিকের আধিক্য। সরকার, প্রশাসন ও দেশের উচ্চশ্রেণির মানুষজন দুই বাংলাতেই এরকম একটা ভয়ংকর বিপর্যয়ে এখনো যথেষ্ট উদাসীন। সরকার ও প্রশাসনকে সক্রিয় করতে প্রয়োজন জনসচেতনতা এবং গণআন্দোলন। তার জন্য আবার প্রয়োজন সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে বোঝা। বাস্তবের এই প্রেক্ষাপট থেকেই ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'তলতিমির'-এর মধ্য দিয়ে জল দূষণ কেন্দ্রিক পরিবেশ চেতনার এক চমৎকার অভিজ্ঞান তুলে ধরেছেন—যা লেখকের সুগভীর সামাজিক দায়িত্ববোধকেই চিনিয়ে দেয়। উপন্যাসটিতে কালীয় নাগের আর্কেটাইপের আঁধারে একালের বঙ্গীয় সমাজ জীবনের অন্যতম অভিশাপ আর্সেনিক দূষণ ও তাকে ঘিরে থাকা ক্ষমতাকেন্দ্রের কুশীলবরদের আসল চেহারা লেখক আশ্চর্য নিঃস্পৃহতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসটির গভীরে প্রবেশের পূর্বে উপন্যাসে ব্যবহৃত মিথটি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। মিথটি ভাগবত পুরাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তবে লেখক তাকে আধুনিক ব্যাখ্যায় হাজির করেছেন। কালীয় নাগের বিষে জর্জরিত কালীদহের জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য কৃষ্ণ কালীয় দমনের যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন সে গল্প অনেকের জানা, কিন্তু কে কেন কালীয়কে কালীদহে ঠাঁই দিয়েছিলেন সে বৃত্তান্ত ঘিরে এই মিথটি গড়ে উঠেছে। আখ্যান মধ্যে লেখক স্বয়ং জানিয়েছেন—

> ''কালীয় ছিল সর্পরূপী অভিশপ্ত এক গোষ্ঠী প্রধান। বাস করতো রমন দ্বীপে। গোষ্ঠী প্রধান হলেও, ব্রাত্য ও অপাংক্তেয় বর্গ মানুষের প্রতিনিধি হবার ফলে সে যুগে সমাজে তাদের প্রতিপত্তি ছিল না। ...গরুড় কালীয় গোষ্ঠীর কাছেও হুকুম জারি করেছিল, প্রতিদিন একটি

সর্পকে আত্মত্যাগের জন্য পাঠাতে হবে। গরুড় উদর পূরণ করবে সেই বেচারাকে দিয়ে।''[২]

এইভাবে ঋতুর পর ঋতু পেরিয়ে গরুড়ের শাসন বলবৎ থাকলো। তার বাদান্যতায় কালীয় গোষ্ঠীর প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হলে গোষ্ঠীপতি কালীয়র হুঁশ ফিরল। সে এর প্রতিকার করতে উপস্থিত হলো সৌভরি মুনির কাছে। সৌভরি কালীয়কে অভয় দিয়ে বললেন–

''তুমি কালীদহে চলে যাও, ওখানে হ্রদের জলে নিরাপদে বাস করতে পারবে।''[৩]

কালীদহে পৌঁছেই কালীয় হ্রদের গভীর জলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। এই বিশাল সমাজের সে হলো একচ্ছত্র অধিপতি। তার এই নতুন মনোপলি যে ভবিষ্যত পর্যাবরণ বা পরিবেশ রক্ষায় সমস্যার সৃষ্টি করবে, সৌভরি মুনি উপলব্ধি করতে পারেনি। এভাবেই শোষিত শোষক হয়ে ওঠে, পুরনো ক্ষমতা ভেঙে নতুন ক্ষমতা জন্মদেয় ভিন্ন পাপের। যতদিন বাড়তে লাগলো কালীয় অন্য প্রাণীদের কাছে কালান্তক হয়ে উঠলো।

''তার বিষে সমস্ত হ্রদের জলে বিষাক্ত হতে থাকলো। ক্রমে কালীদহের জল হয়ে উঠলো কৃষ্ণবরণ, গড়ল আঁধার। যে সব মৎস্য ও জলচর প্রাণীদের জন্য সৌভরি মুনির হৃদয় কেঁদেছিল, কালীয়র একচ্ছত্রের ফলে, বিষের প্রভাবে, সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এমনকি তীব্র বিষের তেজ সাবধান সীমা ছাড়িয়ে গেল এমন ভাবে, এই হ্রদের উপর দিয়ে পাখি উড়ে গেলেও হলাহলে মুখ থুবড়ে মরে থাকতো। ...এই বিষ প্রতি মুহূর্তে আত্মগত করে যে–যে জল প্রাণী বা মৎস্যকূল সহজ সীমায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছিল, তাদের ভোক্তারা অসুস্থ হতে থাকলো।''[৪]

এই মূর্তিমান অভিশাপকে হত্যা করে সবাইকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই ঘটনার পরই আধুনিক এক সমস্যায় লেখক প্রবেশ করেছেন–সমস্যার নাম আর্সেনিক দূষণ। সমগ্র উপন্যাসের আখ্যান ভাগটি বিশেষ একজন সাক্ষীদাতার বয়ানে উপস্থাপিত যে কিনা অদৃশ্য বিচারকের সামনে একটি মামলায় সাক্ষীদেবার ভঙ্গিতে সমস্ত বিষয়টি আগাগোড়া বলে গেছেন। যেমন–

"তো, ধর্মাবতার, আজ এই তো দহ, যমুনা এবং গোঠের শস্যক্ষেত্র। দিনরাত ভুট ভুট স্যালোর আওয়াজ, হাই ইলডিং চাষ। পাঁচ হাজার বছরের নিষাদ, দুসাদরা নেই বটে, আছে রবি দাস পাড়া, সর্দার পাড়া। কালীয় কি আজও শুয়ে আছে? অভিশপ্ত কালে নতুন শাপগ্রস্ত দেহ নিয়ে ঐ জলে? পাঁচ হাজার বছর পরেও?"[৫]

কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র অন্নপূর্ণা। গাঁ ঘরের অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে অন্নপূর্ণা। জাতের বিচারে সে অন্ত্যজ। বিয়েও হয় তেমনই ঘরে। সচরাচর এসব ঘরে যা ঘটে না, অন্নপূর্ণার জীবনে তা ঘটেছিল। সে কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিল। তাই শিক্ষা আর স্বাস্থ্য বিষয়ে অন্যদের তুলনায় সে একটু বেশি সচেতন ছিল। অথচ শেষ অবধি তার জীবনেই ঘটে গেল চরম বিপর্যয়। সকলকে সতর্ক করে নিজে সাবধানে থেকেও বিপর্যয়কে সে এড়াতে পারলো না। আর্সেনিক বিষ তাকে গ্রাস করলো এবং সে প্রাণ হারাল। উপন্যাস শুরু হয়েছে এই মৃত্যুর ঘটনা দিয়েই এবং বলাবাহুল্য লেখক বারবার ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে গেছেন অতীত সময়ের ঘটনা বর্ণনায়। উপন্যাসের সূচনাতেই কথক অন্নপূর্ণার বাচনে তুলে ধরেছেন তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে উচ্চারিত শর্তের প্রসঙ্গ—

"আমি যদি মরি, একটা কাজ তোমার করতি হবে। ...ঐ বনবিবি ফেইলি দিতে হবে ...ঠাকুর মিথ্যা।"[৬]

আসলে গ্রাম বাংলার দরিদ্র মানুষেরাই যেকোনো অসুখে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। কারণ, গ্রামের পরিবেশও যেমন দূষিত, তেমনই দারিদ্র্যের জন্য তাদের দেহে পুষ্টিও সন্তোষজনক নয়। শহরাঞ্চলের মানুষের মতো তারা শোধিত নিরাপদ পানীয় জল না পেয়ে আর্সেনিক দূষিত জল পান করতে বাধ্য হন। এরপর একে একে এসেছে অন্নপূর্ণার 'হলুদ রোগে' আক্রান্ত হওয়ার কথা। যেমন—

"ঋতুমতী হওয়ার কিছু পরেই সে হলুদ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ওরা বলাবলি করত ন্যাবা! কী হলুদ, কী হলুদরে বাবা! চোখের ঢ্যালাজোড়ার সাদা অংশটুকু ঠিক কমলার বাকলের মতো—সর্বদাই অসহায় করুণ ভাব। ঠোঁটে যেন হরিদ্রার গুড়ো মেখেছে এবং

ওর ধবধবে ধবল বর্ণটি আক্রান্ত হলুদের চাপে বিপন্ন। একদানা অন্ন পর্যন্ত মুখে তোলার সাধ নেই। কী অসম্ভব দুর্বল, ন্যাতানো লতার মতো পড়ে থাকে বিছানায়।"[৭]

ক্রমশ আমাদের চোখে পড়ে দীন ফকির কর্তৃক সেই রোগ সারানোর চোখে দেখা বাস্তবতা। এসেছে অঞ্চল জুড়ে চলা মদের ব্যবসা এবং সেই মদের চোরাবালিতে অঞ্চলের যুবকদের তলিয়ে যাওয়ার চিত্র। এসেছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রথম টিউবয়েল বসানোর প্রসঙ্গে। যেমন—

"মাস ছয়েক পর, ওরা বিস্ময়ে দেখতে পেল একদিন সকালে পাড়ায় ঢুকবার মুখে কিছু বাইরের মানুষ। কী সব মেপে ঝুপে চলে গেল বড় রাস্তার পাশে এবং এর কিছু পরেই বসানো হয়েছিল ৩০ পাইপের একটি টিউবওয়েল। সেই মানুষগুলিই জানিয়ে গিয়েছিল সর্দার পাড়ার সব্বাই যেন খাওয়ার জলটুকু ঐ সরকারি নতুন চাপা কলটা থেকে নেয়।"[৮]

লেখক খুব সচেতনভাবে অতীত ও বর্তমানকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে অন্নপূর্ণার মৃত্যু একটা মানুষর মৃত্যু মাত্র নয়। মৃত্যু বিশ্বাসের। মৃত্যু আশ্বাসের। অন্নপূর্ণার মৃত্যু তাই আমাদের মনকেই শুধু বিষণ্ণ করে না, হৃদয়কেও রক্তাক্ত করে।

'কালীয়দমন' পর্ব থেকেই মূল সমস্যায় প্রবেশ করেছেন লেখক। 'সময়ের পুরাকীর্তি এবং গ্রাম্য গেধিকারা' পর্বে আর্সেনিক দূষণ ছড়ানোর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে আছে বাণীতলা বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যদের আর্সেনিক নিয়ে প্রচারাভিযানের কথাও এবং এই প্রসঙ্গেই এসেছে গ্রামের মানুষের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য এবং গ্রাম্য রাজনীতির বাস্তবতা। বিজ্ঞান মঞ্চের প্রচারাভিযান পণ্ড করতে স্থানীয় ক্ষমতাকেন্দ্রের কেষ্ট বিস্টুদের বাঁধা দানের কথাও লেখক জানিয়েছেন। যেমন বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যদের প্রচার করতে দেখে দুটি ছেলে এগিয়ে আসে, তাদের সঙ্গে বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যদের কথোপকথন দৃশ্য এরকম—

ক. "—কোন পার্টি দাদা?

—পার্টি-ফার্টি না। বিজ্ঞান সংস্থা।

—সেকি হয়? একজন সরল হাসি দিয়ে বলে—সব কিছুর মধ্যেই পার্টি আছে মশাই, ঐ সিপিএম, না হলি কংগ্রেস।"[৯]

খ. ‘‘রত্না কিছুটা আশঙ্কায়, সংযত মেজাজে বলে—ভাই, সিপিএম, কংগ্রেস ছাড়া কি গ্রামে অন্য কোনো সমস্যা থাকতে নেই? ... আসুন না, মিলেমিশে সবাই আমরা কাজ করি!

—দিদি, সবাই প্রথম প্রথম এইসব বাতলিং দেয়!’’[১০]

তৎকালীন বঙ্গীয় বাস্তবতাকে কি অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। উপন্যাসের আখ্যানে আর্সেনিকের সংকট লেখক উপস্থাপিত করেছেন এইভাবে—‘জলের মধ্যে আমরা আর্সেনিকের চার রকমের মূর্তি দেখতে পাই। (১) আর্সেনাইট (২) আর্সেনেট (৩) মিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড এবং (৪) ডাই মিথাইল আর্সেনিকো অ্যাসিড। ...বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পানীয় জলে আর্সেনিকের পরিমাণ অনুমোদন করেছে .০১ মিলিগ্রাম/লিটার অর্থাৎ ১ লিটার জলে ১ মিলিগ্রামের একশ ভাগের একভাগ আর্সেনিকের পরিমাণ থাকলে, তা পান করা যেতে পারে নির্ভাবনায়। ...গবেষণায় জানা গেছে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ভূ-স্তর—যা আর্সেনিকপুষ্ট এবং কাদা পলিদ্বারা গঠিত—ভূ-তল থেকে ৭০ এবং ২০০ ফুট গভীরের মধ্যে অবস্থান করছে। এই স্তরটি আমাদের ভাগীরথী-হুগলী নদীর নিম্নাঞ্চল ধরে বাংলাদেশের ওপাশেও ছড়ানো। গবেষকরা জানতে পেরেছেন, গ্রীষ্মের শুখা দিনে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের বিপুল পরিমাণ ব্যবহারই ঐ স্তরটির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এলোপাথাড়ি ডিপ এবং স্যালো নলকূপ দিয়ে জল টেনে তুলবার ফলে ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত—যখন বৃষ্টি হয় না—জলতল অত্যন্ত নীচে নেমে যাওয়ায় পাইরাইট নামে এক ধরনের মিনারেল, আর্সেনিক মিলেমিশে লুকিয়ে থাকে যার মধ্যে, জলতলের শূন্যস্থানে বায়ুর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিষে পরিণত হয় এবং ছড়িয়ে গিয়ে সমস্ত স্তর আক্রান্ত করে।’’[১১]

সাধন চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসটিতে দেখিয়েছেন, গাজন ও পাঁচপোতা অঞ্চলের মানুষ ৭ মিলিগ্রামের বেশি মাত্রার জল পান করে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বিজ্ঞানমঞ্চের আর্সেনিক দূষণ নিয়ে সক্রিয়তা স্থানীয় রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দেয়। সরকারি ও বেসরকারি দুই দলই এর থেকে ফায়দা তোলার চেষ্টা করে। এসবের মাঝে কালীয় রূপ আর্সেনিক আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানব্রতীদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রামপ্রসাদ আর্সেনিকের বিষের

শিকার হয়। এরপর সর্দার পাড়ার শ্যামা হালদার বলি হয় এবং অন্নপূর্ণাও অকালে মারা যায়। এরই মধ্যে সরকারের সঙ্গে জাপানের চুক্তি অনুসারে যমুনার জল পরিশুদ্ধ করে পাইপে টেনে অঞ্চলের জনগণের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য পাইপ বসে কিন্তু সেখানেও পড়ে রাজনীতির থাবা। তাই রবিদাস পাড়া, গাজন এবং সর্দার পাড়ায় পাইপ ঢোকে না।

মিথ পুরাণ যেকোনো দেশ বা জাতির শেকড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর তাই আমাদের স্মৃতিতে, মননে, হৃদয়ে তা সঞ্চারিত অনায়াস গতিতে, নীরব স্বাচ্ছন্দ্যে। হৃদয়ের গভীরে সঞ্চারিত বলেই মিথ এখনো আধুনিক পাঠকৃতির বিষয় হয়ে ওঠে। বর্তমানকে বুঝে নিতে, উত্তরাধুনিক সমস্যাকে ব্যাখ্যা করতে, তার রসসন্দর্ভ নির্মাণ করতে বর্তমানের সাহিত্য রচয়িতা বারংবার তাই মিথের সাহায্যপ্রার্থী। সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ও তাই তাঁর 'জলতিমির' উপন্যাসে বর্তমান সমস্যাকে ব্যাখ্যা করেছেন দেশীয় মিথেরই আশ্রয়ে। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

> "সর্পদেহী কালীয় যে হলাহল বহন করত...তার বিষে সমস্ত হ্রদের জল বিষাক্ত হতে থাকল। ক্রমে কালিদহের জল হয়ে উঠলো কৃষ্ণবরণ, গরল-আঁধার। কালিদহের চারপাশে ছিল কিছু জনপদ। নিষাদ, ধীবর, গঙ্গোতা, দুসাদ, মুচি বাস করত। এইসব পরিবারে অবাধ যাতায়াতে কৃষ্ণ টের পেলেন এদের হাত-পা, মুখমণ্ডলে কালো ছোপ-ছোপ, চোখের কোলে ক্লান্তি। তিনি অবশ্য টের পাননি, দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোও–ফুসফুস, লিভার, কিডনি–ক্রমান্বয়ে নিঃশব্দে ধসতে শুরু করেছে। জানতে পারলেন না বারোমাস এরা সর্দি-শ্লেষ্মা, অজীর্ণ-আমাশয়ের দাপটে নিস্তেজ। মাঝেমাঝেই কাশিতে রক্ত ওঠে এবং হঠাৎই যায় মরে। অঞ্চলের গড় আয়ু অত্যন্ত কম। এ অঞ্চলে পানীয় জলের অন্য কোনো উৎস নেই। ধীবর, নিষাদ কিংবা দুসাদরা বারোমাস বছরের পর বছর এই হ্রদের জল পান করতে বাধ্য। অঞ্চলটি নগর থেকে বহুদূরে, তাই পয়ঃপ্রণালী, শৌচাগার বা অন্যান্য স্বাস্থ্যসম্মত বিধি কিছু নেই। চাষবাস, গবাদিপশুর চান, মানুষের ঘরের কাজ, রান্নাবান্না, বাসনমাজা, পিপাসার জল–সবই কালিদহের হ্রদে। মূল উৎসে বিশেষ কেউ আসেনা। ভয় পায়, সেখানে দীর্ঘকালের ভোগদখলের ফলে কালীয়র একছত্র অধিকার। তার পছন্দ নয় দ্বিতীয় কেউ এর সীমানায় প্রবেশ করুক।"[১২]

আমরা মহাভারতে দেখেছি কৃষ্ণ কালিয়নাগকে শাস্তি দিয়ে সকল মানুষকে বিপদমুক্ত করেছিলেন কিন্তু একালের কালিয়নাগের বিষ থেকে রক্ষা নেই। আলোচ্য উপন্যাসে তাই আর্সেনিক দূষণ জয়যুক্ত হলো। আধুনিক কৃষ্ণের দল (বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা) শত চেষ্টাতেও আর্সেনিক সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। ফলত রামপ্রসাদের মতো সাধারণ ঘরের মেয়ে অন্নপূর্ণাও আর্সেনিকের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে। পুরাণের ঘটনা বা মিথকে ব্যবহার করে এই নতুন তাৎপর্যে নতুন বিশ্ব গড়ার এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে লেখকের ভাবনার স্বাতন্ত্র্যকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে পরিবেশবাদী 'জলতিমির' নিশ্চিতভাবেই ল্যান্ডমার্কের সম্মান পাবে। আর্সেনিক দূষণ যে কতোটা ভয়াবহ তা সাধারণ মানুষ ততোটা জানে না। জানে না বলেই ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গুর মতো আর্সেনিক নিয়ে তাদের ভাবনা বা দুর্ভাবনা তেমন চোখে পড়ে না। তাই জনপ্রতিনিধি থেকে সরকার, প্রশাসন একে উপেক্ষার নজরে দেখে। আমরা জানি ২০০০ সালে মালদহে বেশ কয়েকজন আর্সেনিকের বলি হয়। ওই বছরই বেহালায় আর্সেনিক থাবা বসায়। একটি সমীক্ষায় জানা গেছে বালি থেকে বাঁশবেড়িয়া আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চল। ডানকুনির একটা বড়ো অংশের মানুষকে জলের বোতলের পেছনে যে এত অর্থ প্রতিদিন খরচ করতে হয় তার কারণ আর্সেনিক। আর্সেনিক আক্রান্ত একদিনে মরে না। ধীর এর বিষক্রিয়া। প্রতিদিন বাড়তে থাকে এর বিষক্রিয়ার মাত্রা। একসময় ভূ-গর্ভস্থ এই বিষ সেই আক্রান্তের প্রাণ হরণ করে। গোটাটাই দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া। এই ভয়ঙ্কর দূষণই সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির' উপন্যাসের প্রকৃত কেন্দ্রীয় চরিত্র বা Protagonist Character।

সাধন চট্টোপাধ্যায় 'শেষ রাতের শেয়াল' উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন পুঁজিবাদী সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ঐতিহ্য, নিজস্ব সংস্কৃতি সমস্ত কিছু ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। উন্নয়নের নামে নদী গ্রাস করে সভ্যতার সর্বভূক ফণা। আর এই বাস্তবতাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে উপস্থাপিত করেন ফ্যান্টাসি। যেখানে বেঁচে থাকা মানুষ ও মৃত মানুষের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। আর সেজন্যই বাস্তবের সোনাই নদী আজকে 'Unreal'। কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র তরুবালার জবানীতে গোটা ঘটনা বিবৃত হয়েছে। গ্রীনবেঞ্চে সোনাই নদীর একদা অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হওয়া জনস্বার্থ মামলার প্রসঙ্গ দিয়ে কাহিনির সূচনা। তরুবালার কথা থেকেই জানা যায়, জনৈক ভাস্কর নাইয়া তাঁর মনে প্রোথিত করেছিল এককালের পরিচিত নদী সোনাই এর পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন—

"সেই নদীটির নাম সোনাই। ভাস্কর নাইয়া যে নদীটি খুঁজে পুনরুদ্ধারের গোপন মন্ত্রণা দিয়ে গিয়েছিল, তার নাম সোনাই। পুনরুদ্ধার কেন? প্রশ্ন শুনে ও বলেছিল, যা ছিল, যা এখন নেই, তা খুঁজে পাওয়াই পুনরুদ্ধার!"[১৩]

অন্তর্গত রক্তে সঞ্চারিত সেই স্বপ্নকে সাকার করতে ওঁরাও জনগোষ্ঠীর Cultivated তরুণী তরুবালা সোনাই নদী পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে মামলা শুরু করে। তরুবালা ওঁড়াও হলো ওঁড়াও জনজাতির মধ্যে অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী একজন মেয়ে। সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং উচ্চ মাধ্যমিকে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। তার পরিবারের মধ্যে তরুবালাই সবচেয়ে বেশি লেখাপড়া জানা। তার বাবা শুধুমাত্র নাম সই করতে জানে কিন্তু ঠাকুরদা সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তবে তরুবালা B. A. Part One শেষ করার আগেই সরকারি ডাক বিভাগে চাকরি পেয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে আর অতিরিক্ত ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে স্থানীয় ডাকঘরের পিওন সে। দুপুরে সাইকেলে করে তাকে গোটা এলাকা ঘুরতে হয়। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। বাইশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সে বিয়ে খুব বেশিদিন দীর্ঘায়িত হয়নি। আদিবাসী কল্যাণ সমাজ নামে যে ক্লাবটি পাড়ায় রয়েছে—তরুবালা তার একজন সদস্য। ভাস্কর নাইয়া একটা জীর্ণ, পোকায় কাটা বহু পুরনো মানচিত্র খুলে ধরেছিল এ ক্লাবের সভায়। তরুবালা প্রতিদিন সাইকেলে করে গ্রামে চিঠি বিলি করতে করতে প্রায় দেড় বছরের মধ্যেই টের পেয়ে যায় যে সে নদীটির উপরে অবস্থিত ঘিঞ্জি জনবসতির মধ্যেই তাকে আসলে চিঠি বিলি করতে হয়। একদিন খবরের কাগজেও সোনাই নদীর নাম ছাপানো হয়। তখনই তরুবালা মনে মনে যোগ করতে শুরু করেছিল অসংখ্য ডোবা পুকুরের মাছগুলো যা এখনো মাসে মাসে দু-চারটি বিলুপ্ত হয়ে আবাসনের সৌন্দর্যে বিশেষ মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে।

যে ভাস্কর নাইয়ার কথা শুনে তরুবলার মনে নদী পুনরুদ্ধারের ইচ্ছে সংক্রামিত হয়েছিল, সেই ভাস্কর নাইয়া তরুবালার নদী পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে পাশে দাঁড়াতে পারেননি। তরুবালার জবানীতে লেখক জানিয়েছেন—

"ভাস্কর, তুমি কেন জেলে পচছ? তোমার সম্পর্কে কত কিছু শুনি চারধারে! তুমি নাকি আসলে ডাকাত, প্রাইভেট আর্মির সেনাপতি, গুপ্তচর, অস্ত্র ব্যবসায়ী—কতো কী? অথচ

তোমার সঙ্গে মিলেমিশে বুঝেছি, তুমি গ্রীনবেঞ্চে জায়গা করে নিয়েছ। সোনাইকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কারণ নদীটাকে সংঘবদ্ধ ভাবে চুরি করা হয়েছে। এমন সংঘবদ্ধ উদ্ধারের পথ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। যে নদী আটকে গেছে, যাকে আর এগোতে দেওয়া হয়নি, তাকে ফিরে পেতে গেলে পেছনের স্রোত ধরে হাঁটতে হবে। কিন্ত শুধুই পেছনে হেঁটে লাভ? পেছনের সবটাই তো আমাদের খোঁজার অপেক্ষায় থাকে না, মরে-পচে গন্ধ ছড়িয়ে উগ্র মাদকতার সৃষ্টি করে কেবল।"[১৪]

অর্থাৎ ভাস্কর নাইয়া মিথ্যে মামলায় আড়াই বছর ধরে জেলে রয়েছেন। আর তরুবালা সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা, হুমকি অতিক্রম করে তার গতি অব্যাহত। গ্রীনবেঞ্চে সোনাই নদীর একদা অস্তিত্ব নিয়ে যে জনস্বার্থ মামলা তরুবালা করেছিল তার সূচনা লগ্নেই দেখা গেছে নানাভাবে তরুবালাকে আটকানোর প্রচেষ্টা। যেমন—একদিন ছোটোখাটো এক মোড়লকে নদী সংক্রান্ত ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই তিনি ফোঁস করে ওঠেন, বলেন—

"নদী? কিসের নদী? পুরনো ম্যাপে নাকি পাওয়া যাচ্ছে? কোনো নদী-ফদি নাই এখানে! এগুলো ষড়যন্ত্র। কিসের ষড়যন্ত্র? উৎখাতের? আর দেশটাকে ভাগ হতে দেব না আমরা! দরকারে রক্ত ঝরাব!"[১৫]

এই কথাগুলো শোনার পর তরুবালা বুঝতে পারে কেন পাড়ার ক্লাবের লোকেরা ভাস্করকে পছন্দ করতো না। আসলে তারা সংখ্যালঘুত্বের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে চাকরি চায়, অন্য কোনো ইস্যুতে জড়াতে চায় না। আবার পোস্ট অফিসের মাস্টারমশাইও তরুকে বলেছিল—

"নদীই তোমায় খেয়েছে। বেশ তাঁত বুনে খাচ্ছিলে, এঁড়ে-বাছুর কিনে মরো এবার! ... গ্রীনবেঞ্চ, উৎখাত, এন.জি.ও., পরিবেশ রক্ষা, ...শোনো বাপু মেয়ে একটা কথা, ও সব বদলাবার দায় তোমার-আমার নয়। এক জীবনের বেশি তো বাঁচবি না, খেয়ে পরে সুখ করে নে। চারপাশ যে নিয়মে চলার, চলবেই।"[১৬]

নদী পুনরুদ্ধার আন্দোলনের প্রথম সারির একজন হলেন তরুবালা। দু-চারবার ছবিসহ নামও ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে। তরু গ্রেপ্তার হয়েছে বেশ কয়েকবার, খালাসও পেয়েছে। দু-একটি

রাজনৈতিক দল থেকে ওয়ার্ড কাউন্সিলর—জনপ্রতিনিধি হওয়ার আমন্ত্রণও এসেছিল তরুর কাছে। তরু রাজি হয়নি। তরু এখন এলাকায় পরিচিত নাম। শাসিয়ে আর ওকে বোকার মতো দমানো যায় না। গ্রীনবেঞ্চে মামলা ওঠার ৯ দিন আগে তরুবালা খুঁজছিল একটি দরগার সন্ধান। কারণ অনেক বছর আগেই তরু খোঁজ পেয়েছিল যে, এই নদীরই পাশে ঘনবসতি অঞ্চলে দেওয়াল ঘেরা দশ ফুট বাই আট ফুট একটি দরগা আছে, যেখানে ঐতিহাসিক সময়ে এক কলন্দরি-পীর নির্জনে সাধনা করতেন। ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে, কারণ এ নিয়ে কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে। তবে গ্রীনবেঞ্চে মামলা ওঠার আগের মুহূর্তেও তরুবালার কাছে থ্রেট আসে—

> "একদিন আমাকে থ্রেট দেওয়া হল, নদীর ভাবনাটা ছেড়ে না দিলে, প্রচার করা হবে আমি আসলে গোপন শত্রু বা কারও এজেন্ট।"[১৭]

আসলে নদী বাঁচানোর জন্য তরুবালার এই মামলা আন্দোলন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বাস্তব বিষয়। এই বাস্তবতার ভিতেই লেখক গড়ে তোলেন এক তথাকথিত Unreal আখ্যান। একদা নদীর কতোটা কে কীভাবে দখল করে রেখেছে, তা দেখতে বেরিয়ে পড়ে তরুবালা। তার এই যাত্রার সূত্র ধরেই Unreal আখ্যানের জন্ম হয়। পথে বেরিয়ে তার সঙ্গে প্রথমে দেখা হয় সুন্দর কুণ্ডুর এবং তারপরে দেখা হয় ফণীবাবুর সঙ্গে। তারা তরুবালাকে জানায় হারিয়ে যাওয়া নদী সোনাই কোনো রূপকথার গল্প নয়। এককালে সে সত্যি সত্যিই ছিল। পথ চলতে চলতে এই কথোপকথন চলতেই থাকে, পথচারীর সংখ্যাও বাড়ে এবং আসে শৈল ও মাধব। চলতে থাকে কথোপকথন। এই কথোপকথনের মাঝে ফণীবাবু হঠাৎ একটি সরু গলি ধরে মিলিয়ে যান। মাটির পথ হঠাৎই বরফের পথে রূপান্তরিত হয়। সে পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যায় শৈল। পরে ঠিক একইভাবে মিলিয়ে গেলেন সুন্দর কুণ্ড এবং মাধব। চলতে চলতে তরুবালা নিজের বাড়ির গলির মধ্যে এসে পড়ে। এতক্ষণ সে যেন ঘোরের মধ্যে ছিল। এইমাত্র বাস্তবে ফিরে আসে। তার মনে পড়ে সুন্দরবাবু বলছিলেন, বাস না চলার কথা অথচ বাস্তবে বাস চলছে। তরুবালার এসব দেখে মানসিক স্থিতি বিপন্ন হয় এবং সুন্দরবাবু বহুদিন পূর্বেই মারা গেছে—এই সত্য জানার পর তার মানসিক স্থিতি আরও বিপন্নতায় পড়ে। তার মনে হতে থাকে সবাই 'মৃত'। একসময় গ্রীনবেঞ্চে

মামলা উঠলে তরুবালা এলাকায় পূর্বে অবস্থিত দরগার প্রমাণ দিতে না পারায় বিচারক নদী উদ্ধারের পুনরায় রায় দান স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। কিন্তু তরুবালার মতে—

> ''সোনাই'-কে তো মৃত বলে আধুনিক জমির ম্যাপ লেখা হয়েছে। কিন্তু পুরনো মানচিত্রে সে জীবিত।''[১৮]

লক্ষণীয়, লেখক 'অতীত' বলে কোনো স্থির অচল অটল ধারণায় বিশ্বাসী নন। তাঁর কথায়—

> ''আজকে যা অতীত তা একসময় বাস্তব ছিল। আজ সেকাল বা সেকালের মানুষগুলি হয়তো আর নেই, কিন্তু আছে তাদের অশরীরী অস্তিত্ব—স্মৃতিতে, কর্মপ্রবাহে কিংবা ভবিষ্যতের, বর্তমানের অন্তর্গত রক্তে।''[১৯]

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এই বিশিষ্ট জীবনবোধ উপন্যাসটির পরিণতিতে ভাষা পেয়েছে। ফলে নদীটি নেই কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনপদ রয়ে গেছে। রয়ে গেছে তার রেশ সেই জনপদের মানুষের স্মৃতিতে, সংস্কৃতিতে। একইভাবে সুন্দর কুণ্ডু, ফণীবাবু, মাধব, শৈল আজ মৃত হলেও একদা তারা এই পৃথিবীর নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনপদেরই বাসিন্দা ছিল। তাই বাস্তবে নয় স্মৃতির সরণী বেয়ে তারা নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে। এইভাবে নদী ও এই মানুষগুলি একই ভূমিতে এসে যায়। ম্যাজিক্যাল উপাদান ও রিয়েলের মেলবন্ধনের মুন্সিয়ানায় লেখক তাঁর পাঠকৃতিটিকে তাৎক্ষণিক সময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে শাশ্বত জগতের ছাড়পত্রও বোধহয় এনে দেন। আসলে সাধন চট্টোপাধ্যায় ঘোষিতভাবেই পুঁজিবাদী সভ্যতা, কর্পোরেট কালচার ও ব্যবসায়িক আগ্রাসনের বিরোধী। ফলে এই উপন্যাসটিও কর্পোরেট পুঁজিবাদী কালচারের বিরুদ্ধে তোলা একটি স্পষ্ট তর্জনীপাত। আজকের দিনে কর্পোরেট লগ্নিপুঁজি তার সুবিধার্থে সবকিছু মুছে দিতে চায়—স্বতন্ত্র সমাজ, সংস্কৃতি। এখানেই লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ। আর এই প্রবণতা রুখতেই তিনি বারংবার শিকড় সন্ধানী, এখানেও সেই সন্ধান অব্যাহত নিরঙ্কুশ বলিষ্ঠতায়। জাদু বাস্তবতার মায়াবী আলো সেই উদ্দেশ্যকে আড়াল করে না, বরং তাকে আরও স্পষ্টতা দেয়।

সাধন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' উপন্যাসটি এক পরিবেশ সচেতন মানুষের একক সংগ্রামের কাহিনি। আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুধাময় একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি।

তবে আর পাঁচটা বাঙালি মধ্যবিত্তের মতো তিনি সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন, আত্মকেন্দ্রিক নন। তিনি পরিবেশ সচেতন মানুষ। তিনি জানেন পরিবেশ বাঁচলে মানুষ বাঁচবে। এই সচেতনতা থেকেই তিনি প্রতিবেশীর পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে কারখানা নির্মাণের বিরোধিতা করেন। কারও দু-পয়সা রোজগারে বাগড়া দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনিও সকলের মতো প্রত্যাশা করেন কারখানা হোক, তবে তা যেন পরিবেশকে ক্ষতি করে গড়ে না ওঠে। আর তার এই প্রচেষ্টা শুরুতেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। আসলে আমাদের চারপাশে এমন এক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত যেখানে ক্ষমতাই সবকিছুর মূলে। যারা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বন্ধুবৎসল তারা সমাজের পক্ষে এমনকি পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর কাজগুলো যেন অনায়াসেই করতে পারেন। তাদেরকে কেউ বাঁধা দান করেন না। তারা পুকুর বুজিয়ে বা জলাশয় মাটি দিয়ে ভরাট করে সেখানে গৃহ নির্মাণ করতে পারেন বা বেআইনি কাজ তারা নির্দ্বিধায় করে যেতে পারেন। যদি কেউ বাঁধা দান করতে আসেন, তাহলে সেই ব্যক্তিটি হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীদের রোষের শিকার এবং নানাভাবে তাকে হেনস্থা করা হয়। সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দোলাচলতা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই যেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। যেমন আমাদের আলোচ্য 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' উপন্যাসটি পাঠ করলে বোঝা যায়, কীভাবে পরিবেশ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জলাভূমি ভরাট করা হয় এবং মুহূর্তে বদলে ফেলা হয় জমির চরিত্র। দূষণ আইনকে তোয়াক্কা না করে লোকালয়ে কারখানা স্থাপন করাও হয়ে ওঠে স্বাভাবিক ঘটনা। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে কপালে জোটে তীব্র অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা। পুলিশ প্রশাসন এমনকি পরিবেশ দপ্তর সর্বত্র থেকেও কোনোরকম সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া যায় না। যদিও এই পরিস্থিতি বর্তমান সময়েও চলমান। এই চলমান বাস্তবতারই শিল্পভাষ্য 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' উপন্যাসটি।

ভারতবর্ষে সংঘটিত 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনের কথা আমরা সকলে জানি। যে আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মেধা পাটেকার। ১৯৮৫ সালে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রক্ষা করেছিলেন আমাদের নর্মদা নদী, তার তীরের পরিবেশ-প্রতিবেশ আর লক্ষ লক্ষ মানুষের বাসস্থান। এই আন্দোলনটি কার্যকরী করে তুলতে তাঁকে প্রায় বাইশ দিনের জন্য অনশন করতে হয়েছে, যা তাঁকে মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে রাজনৈতিক গুণ্ডাদের

শারীরিক অত্যাচার। কিন্তু তাঁর অটল সংকল্পের সামনে ফিরে যেতে হয়েছিল বিশ্ব ব্যাংককে, নতিস্বীকার করতে হয়েছিল সরকারকে। সমস্ত রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তিনি এই আন্দোলনে অবিচল থেকেছেন বলেই নর্মদা নদী আজও বয়ে চলেছে কুলকুল করে। ১৯৭৩ সালে ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল 'চিপকো আন্দোলন'। এলাকায় কারখানা স্থাপনের জন্য তৎকালীন আমলারা ১০০ টি গাছ কাটতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু গ্রামের দুই যুবক সুন্দরলাল বহুগুণা ও চণ্ডীপ্রসাদ ভট্ট গাছ কাটতে বাঁধা দান করেন। গাছকে জড়িয়ে ধরে তাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন। এই দুই যুবকের মূল লক্ষ ছিল যেভাবেই হোক গাছ ও বন নিধন বন্ধ করে পরিবেশকে রক্ষা করা। মেধা পাটেকার বা সুন্দরলাল বহুগুণা ও চণ্ডীপ্রসাদ ভট্টের মতো পরিবেশ আন্দোলনকারীর কর্মকাণ্ডে আমরা কিছুটা অবহিত। কিন্তু নাম-গোত্রহীন অসংখ্য মানুষ যখন নিজ নিজ বাসস্থানের চারপাশে কোনো পরিবেশ অসঙ্গতি নিয়ে প্রতিবাদে নামেন, তাঁদের লড়াই কিন্তু ভীষণ কঠিন ও নির্মম। 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে সেরকমই একজন সাধারণ নাগরিকের নিঃশব্দ সংগ্রামের কথা। উপন্যাসটি রচনায় লেখকের হয়তো উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি। সাধন চট্টোপাধ্যায় নিজস্ব পাঠ-অভিজ্ঞতার সূত্রে বিজ্ঞান মনস্ক বলেই হয়তো উপন্যাসের নতুন ধরণ খুঁজে নিয়েছেন বিজ্ঞানবোধের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে।

উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, সুধাময়ের প্রতিবেশী জীবন সাহার বাগানে যে পার্থেনিয়ামের ঝাড় জঙ্গল বেড়ে উঠেছিল, তা অস্বাস্থ্যকর জেনে সুধাময় প্রতিবাদ করেন। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

> ''দক্ষিণের প্রতিবেশী জীবন সাহার বাগানে পার্থেনিয়ামের ঝাড় জঙ্গল হয়ে উঠেছিল আমি ওনাকে গাছটার অস্বাস্থ্যকর প্রভাবের কথা বুঝিয়েও যখন তাগাদা তৈরি করাতে পারিনি, নির্মূল করবার সামান্য অভব্য রূঢ় ভাষাতেই বলে ফেলেছিলাম—বড্ড ঠ্যাঁটা আপনি। ...জানেন ওর হাওয়া-বাতাসে কি হয়? খবর রাখেন? ...ওর গন্ধে আপনাদের ঘরেও তো হাঁপানি-অ্যালার্জি হতে পারে?''[২০]

আবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে তাদের পাড়ায় দেবল বিশ্বাসের বাড়িতে কীর্তনের মাইকটাও সুধাময় বন্ধ করতে বাধ্য করেছিলেন। যেমন—

"আমিও গত দু-বছর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগে, পাড়ায় দেবল বিশ্বাসের বাড়ি কীর্তনের মাইকটা খুলিয়ে ছেড়েছিলাম। চার-পাঁচ ঘরে পরীক্ষার্থী, মাত্র তিন চার দিন বাকি, বিকেল থেকেই বিকট আওয়াজ। ধর্মের স্বাধীনতা আছে বলে মাইকের যথেচ্ছাচার তো স্বীকৃতি নয়।"[২১]

এর থেকে স্পষ্ট সুধাময় পরিবেশ এবং মানবাধিকার আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। পাড়ার ভেতরের দূষণের তোয়াক্কা না করেই পিচবোর্ডের কারখানা স্থাপন করার চেষ্টা হলেও সুধাময়ই প্রথম এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। যেমন—

"৪০ ঘোড়ার মটোর চলবে মশাই! আমি ট্রায়াল শুনেছি। সমর এফেক্টেড হবে সবচাইতে বেশি। নাইট শিফ্‌ট চললে তো ভয়ঙ্কর। এমনিতেই ৪৫ ডেসিবেলের তলায় থাকা দরকার ও সময়ে...১০০ উপর তো বটেই। তাছাড়া ঐ গাদটা মারাত্মক। মণ্ড থেকে কুঁচি-কাচা যা বাদ যাবে তা ফেলতে ফেলতে মাটি নষ্ট, পচা গন্ধ, কত কি! ইদানিং আমাদের শহরের শেষে বিলটা দেখেছেন? ...এই গাছ ছাঁটা কাগজের ফেলনা অংশ পাম্প থেকে বেছে ফেলে দিতে হয়।"[২২]

অর্থাৎ সুধাময় জানেন পাকাপাকিভাবে কিছু গড়ে উঠবার পর তাদের কোনো কিছুই করবার থাকবে না। সরকার ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার চাইছে, এতে সুস্থ পরিবার স্বনির্ভর হবে—এই বিষয়ে তার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু একটি ঘিঞ্জি পাড়ায় যদি পিচবোর্ডের কারখানা স্থাপিত হয় পরিবেশ আইনকে তুচ্ছ করে—তাতে তার আপত্তি আছে। সেজন্যই তিনি এই কারখানা রুখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

এইভাবে দেখা যায় উপন্যাসের আখ্যান সংহত হয়েছে স্বয়ং কথক এবং প্রতিবেশী নিখিলানন্দ ও তার পুত্র নিন্টুর মধ্যেকার বিবাদকে কেন্দ্র করে। তাত্ত্বিক পরিভাষায় বলা যায় তাঁরা আদতে Binary Opposition, তাদের বিবাদের কারণ জমিতে নির্মীয়মাণ কারখানা। নিখিলানন্দের দিক থেকে এই বিবাদের উৎস মূল তাঁর বা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ, অন্যদিকে কথকের দিক থেকে এই বিবাদের কারণ পরার্থপরতা। কারখানা লোকালয়ে নির্মাণ হলে শব্দ দূষণ হবে, জল দূষিত

হবে—এই ভাবনাই তাঁকে আত্মকেন্দ্রিকতার বিন্দুবৃত্ত থেকে বৃহৎ পরিসরে টেনে আনে। প্রথম দিকে নিখিলানন্দ ও নিন্টু এসব প্রতিবাদকে উপেক্ষা, অগ্রাহ্য করে। এসবই তারা করে ক্ষমতার দর্পে। স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকেন্দ্র তাদের করতলগত। কারখানা নির্মাণের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে গিয়ে কথক সুধাময় তা অচিরেই টের পান। দরখাস্ত পুরসভায় জমা দিতে এসে নিচুতলার কর্মীর উপেক্ষা, বক্রোক্তির মুখোমুখি পড়েন। সেই দরখাস্তের খবর কোনো অজানা পথে পৌঁছে যায় নিন্টুর কাছে। এদিকে মাস অতিক্রম করে দেখতে দেখতে। কিন্তু পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কোনো উত্তর মেলে না। ফোন করতে পৌর প্রধান বলেন তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে উপযুক্ত পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাড়ার কমিশনার মৃণাল বিশ্বাস কথা দেন তিনি ব্যাপারটা দেখবেন। তিনি বলেন—

> ‘‘জ্বালানির কথা বলেছিলে, কোথায়? গন্ধের কথা উল্লেখ করেছ। তাও ঠিক নয়। পল্যুশন বোর্ডের পরিদর্শনের পরই মিউনিসিপ্যালিটি লাইসেন্স দিয়েছে। ...এটা নিয়ে খোঁচাখুঁচি কী দরকার? আমিতো আছি। তেমন হলে আমিই বন্ধ করে দেব।’’[২৩]

অথচ এই ঘটনার তিন মাস পর শব্দের অত্যাচারে এবং দূষণে টেকা দায়। আর এই ব্যাপারটা চেয়ারম্যানকে জানানো হলে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়েন। পরিদর্শক পাঠাবেন বলে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেন। একসময় পরিদর্শক আসেন কিন্তু দায়সারা ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ফিরে যান এবং বলে যান যে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই, তিনি সঠিক রিপোর্ট পাঠাবেন। এই ঘটনার ফল ভুগতে হয় সুধাময়কে। সুধাময়ের ভাষায়—

> ‘‘সন্ধ্যার মুখে আমার বাড়ির সামনে কিছু অচেনা মুখ, নেশাগ্রস্থ চোখ-মুখের অশ্রাব্য গালিগালাজ চালাল ঘন্টাখানেক ধরে। উন্মুক্ত সন্ধ্যায় কেউ দরজা-জানালা খুলল না। অশ্লীল শব্দে আমার স্নায়ু বিকল হয়, মেশিনগানের গুলির মতো সেইসব শব্দগুলো বর্ষিত হতে থাকল। যেন কোনো যুদ্ধ জয়ের পর সেনাপতি হুকুম দিয়েছে সৈন্যদের ফূর্তি মেটাবার জন্য।’’[২৪]

এর থেকে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না তথাকথিত ক্ষমতাতন্ত্রের আসল চেহারা। সমস্যা মেটানোর নামে তারা ভয় দেখিয়ে সমঝোতা করানোর খেলায় মগ্ন। মহকুমা পল্যুশন অফিসারকে বলতে শোনা যায়–

> "আইন ভাঙার নির্দিষ্ট অভিযোগ কোথায়? ...৪৫ ডেসিবেল কি আপনি মেপেছেন? আর PH মাপার ল্যাবরেটরি আমার এখানে নেই...ছোটো পেপার-পাল্প কারখানা ৭৫ কিউবিক মিটার জল প্রতিটনে ছাড়তেই পারে...নিয়ম আছে।"[২৫]

আমাদের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে রাজনৈতিক দলের সরকারের সচেতন ষড়যন্ত্রে, প্রশাসনের সচেতন উদাসীনতায় দিঘি বুজিয়ে, পরিবেশের বুকে হাতুড়ি, গাঁইতি চালিয়ে গড়ে ওঠে নতুন বসতি, শব্দ দূষণের তোয়াক্কা না করেই উচ্চস্বরে পাড়ায় পাড়ায় মাইক বাজে এবং পরিবেশ দূষণের ধারনা ধরেই কারখানা স্থাপন করা হয়। কিন্তু তবুও সুধাময়ের মতো পরিবেশ সচেতন, সমাজ সচেতন মানুষ এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছে বলেই এই সভ্যতা পুরোপুরি দূষণে ধ্বংস হয়ে যায়নি। সুধাময়রা জানেন প্রকৃতির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকাটা কতোটা জরুরী।

প্রায় ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও মহকুমা পরিবেশ দূষণ অফিস থেকে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। সুধাময়ও ব্যক্তিগত নানা কারণে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারছিলেন না। একদিন দুপুরে সজল পালের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়–যিনি কারখানার ব্যাপারে জল টেস্ট করতে পাড়ায় এসেছিলেন। কথোপকথনের মাধ্যমে সজল পাল জানান–হ্যাঁ, PH রিপোর্টটা খুবই হাই। দশের ওপর। ...লোকালয়ের মধ্যে ঐ PH উঠলে, জমি পুকুর নর্দমা দূষিত হবেই। আপনারা চাপ দিন। এর বেশি কিছু আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না।

অর্থাৎ সজল পাল অনেক মাস পূর্বেই রিপোর্ট বানিয়ে অফিসে পাঠিয়েছেন কিন্তু রাজ্য পল্যুশন বোর্ডের ল-অফিসার মি: বিশ্বনাথ রায়ঘটক মনে করেন, সামান্য একটা বোর্ড কারখানা নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না। কেননা তাদের হাতে অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি আছে। এতদিনের লড়াই এইভাবে ব্যর্থ হতে দেখে কোনো মানুষের পক্ষেই ঠিক থাকা সম্ভব নয়। তাই সুধাময়ও অচিরেই অবসাদে আচ্ছন্ন হন। অচেনা আলস্য তাঁকে ঘিরে

ধরে। অদ্ভুত নীল আকাশ কিংবা ঝোপঝাড়-গাছপালার মধ্যে ছোটো ছোটো বাতাসের রহস্য তাঁকে আর মুগ্ধ করে না। ঘরের স্পেস হঠাৎই তাঁর কাছে খুবই সংকীর্ণ মনে হতে থাকে এবং চারপাশে প্রয়োজনীয় শ্বাসের অভাববোধ করতে থাকেন। এই ট্রমার ফলস্বরূপ হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগে তাঁকে ভর্তি করা হয়। প্রায় আড়াই মাস পর তিনি বাড়ি ফেরেন। কাহিনির মোড় ফেরে আচমকাই। চেয়ারম্যান মৃণাল বিশ্বাস পৌরসভার কাজ সেরে ভাদ্র মাসের এক বৃষ্টিস্নাত দিনে বড়ো রাস্তায় নিজের গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে হেঁটেই ফিরছিলেন। গলির মুখে ঢুকে দেখলেন ছাঁট কাগজের জঞ্জাল নিয়ে একটা ম্যাটাডোর দাঁড়িয়ে আছে। তার চাকার চাপে পাকা ড্রেনের পাশের মাটি বসে গেছে। ড্রেনটিও ভাঙতে বসেছে। মৃণালবাবু প্রতিবাদ করতেই বিহারী ড্রাইভার দু-চার কথা শুনিয়ে দেয়। ক্রুদ্ধ মৃণালবাবু ড্রাইভারকে সপাটে চড় কষালে সে নিন্টুকে নালিশ জানাতে যায়। ড্রাইভার মৃণালবাবুকে চিনতো না। তাই বলতে পারে না কে তাকে মেরেছে। এমতাবস্থায় নিন্টু সদলবলে এসে সন্দেহবশত মৃণালবাবুর ঘনিষ্ঠ অপূর্বর উপর চড়াও হয়। তপতীর মুখ থেকে শ্যালকের হেনস্তার সংবাদ পেয়ে ক্ষিপ্ত মৃণালবাবু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। উদ্ধত নিন্টু তাকে বলেন—"পাড়ায় কারো দয়ায় কারখানা টিকে নেই। কোর্ট আদালত যা খুশি করতে পারে।"[২৬] এ কথা শোনার পর মৃণালবাবু জানান—"দেখি, আমি চেয়ারম্যান থাকতে এ কারখানা কীভাবে চলে।"[২৭] এই ঘটনার পর তিনি নিজেই সুধাময়কে ডেকে পাঠান। এতদিন তারই বদান্যতায় নিন্টুদের বাড়বাড়ন্ত ছিল। সেই তিনিই রাজ্য পলিউশন বোর্ডে সুধাময়কে আবার যেতে বলেন। এর জন্য অর্থের সংস্থান করবারও তিনি আশ্বাস দেন। অচিরেই ফল মেলে। শুরু হয় থার্ড পার্টি হেয়ারিং। বিজ্ঞানী মহিম রায়ের গ্রুপকে পাওয়া যায় থার্ড পার্টির ভূমিকায়। তাঁদের নিরপেক্ষ তদন্তে সুধাময়ের অভিযোগের সারবত্তা প্রমাণিত হয়।

সুধাময়ের বাড়িতে দুজন হিন্দিভাষী ব্যক্তির আগমন ঘটে। তারা সুধাময়কে কেস তুলে নিতে বলেন—"আপনি কেসটা উইথড্র করে নিন...এ কারখানা এখান থেকে সরে যাবে! প্রমিস্।"[২৮] বিনিময়ে তাঁকে পুষিয়ে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আদর্শবাদী সুধাময় অস্বীকৃত হলে প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলেন, "হ্যাঁ, তা আপনার মর্জি। কিন্তু মি: পাল, তখন আপনার ভালো-মন্দের দায়িত্ব কিন্তু সব আপনার ওপর।"[২৯] তারপর কয়েকদিন পরে ফোনে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানার কথা বলে তারা বিদায় নেন। সেদিন মধ্যরাত্রিতে 'কাজল' এই ডাক শুনে সুধাময় ওরফে কাজল দরজা

খুলতে তাঁর দাদার প্রবেশ। তিনি জানালেন, D. F.-এর জরুরী তলবে এই রাত্রিতেই তাকে সেখানে যেতে হবে এবং সেই রাত্রেই তিনি খুন হন। দাদার এই পরিণতি সুধাময়কে ট্রমাটাইজড করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি মন শক্ত করেন। স্থির করেন—"একটি কঠিন শব্দের জবাব দিয়েই কাজলকে ভবিষ্যতের পথ ঠিক করে নিতে হবে।"[৩০]

অর্থাৎ ভয়ের শিহরণে উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটেনি। সুধাময়ের আত্মশক্তির নির্ভীক উদ্-ঘাটনেই লেখক আখ্যানের সমাপ্তি টেনেছেন। আসলে লেখক আশাবাদী মানসিকতার শিল্পী। তাই তাঁর উপন্যাসের নায়ক সুধাময় বিরুদ্ধ পক্ষের চোখ রাঙানিতে ভেঙে পড়েন না। বরং শিরদাঁড়া কঠিন করে প্রতিবাদে কৃত সংকল্প হন। এখানেই লেখক সত্তা এবং আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। স্বভাবত এই উপন্যাসের পরিধি খুব বড়ো নয়, কিন্তু এর বাইরে গভীরতা অনেকখানি। সবশেষে এটাই বলবো, পৃথিবীর পরিবেশকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আপোষহীন যুদ্ধ লড়ে যাওয়ার মতো মানুষেরা সমাজে ছিল, আছে এবং থাকবে। তবে এই লড়াই যতটা সংগঠনের তারচেয়েও বেশি প্রতিবাদী ব্যক্তির। আমরা আমাদের চারপাশে চোখের সামনে নিজেদের পারিপার্শ্বিককে দূষিত হতে দেখলেও চক্ষুলজ্জা বা ভীরুতা বা কোনো গোপন স্বার্থজনিত চতুর হিসাব নিকাশের জন্য আমরা প্রতিবাদহীন জড়পিণ্ডের মতো সব ধরনের অনাচারকে মান্যতা দিই। প্রতিদিনের অভ্যাসে প্রশ্রয় পেয়ে বিদূষণ যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, শুধুমাত্র তখনই কারও কারও টনক নড়ে। কিংবা নড়েও না আবার। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' যেন আমাদের অনড় অভ্যাসের বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিক প্রতিবাদ।

'পানিহাটা' উপন্যাসটিতে সাধন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ পাঁচশো বছরের ইতিহাসকে বর্তমান সময়ের আঙ্গিকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। এই সুদীর্ঘ চলমান সময়ের যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায় এবং তার ফলে তৎকালীন পরিবেশের যে একটা ভারসাম্য থাকে সেটারও আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সময়ের নিরিখে অতীত এবং বর্তমান একসূত্রে গ্রথিত হয়ে আলোচ্য 'পানিহাটা' উপন্যাসটি অসামান্যতা লাভ করে। অর্থাৎ উপন্যাসের শুরুতেই পাঁচশো বছর আগে পানিহাটায় যখন চৈতন্যদেব নৌকা করে ফিরছেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার জন্য পানিহাটার ঘাটে কীর্তনীয়ারা খোল-কর্তাল নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তখনকার পানিহাটা ছিল সবুজ

আবরণে ঢাকা, জল, জঙ্গল, কম জনবসতি, প্রশস্ত গঙ্গা প্রভৃতি। সর্বোপরি সেসময়ের পানিহাটায় একটা সুস্থ-স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশকে আমরা দেখতে পাই। কেননা তথাকথিত শহরকেন্দ্রিক যে একটা বাতাবরণ সেই বাতাবরণের কোনো প্রতিচ্ছবি ছিল না। তখন কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা সামরিক প্রভাব চলতো। এরপর পরবর্তী কালে দেখা যায় ধীরে ধীরে পানিহাটা শহর নয় বড়োজোর মফস্‌সলে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে দধীচির সেই অদ্ভুত পরিবেশের ঘটনাটি বর্ণনায় আসছে এভাবে–

> ‘‘পানিহাটা তখন শহর-মফস্‌সলের আলো-আঁধারির পথে দধীচি গাঙ্গুলির শৈশবে নানা বর্ণের ছোঁয়া এসে লাগছিল।’’[৩১]

এরপর দেখা যায় দেশভাগ পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তুরা জবরদখল জমিতে ঘর বাঁধেন। সর্বহারা মধ্যবিত্ত মানুষের ঢল নামে পানিহাটায়। সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও অসম্ভব রকমের বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপরে আখ্যানের পরিসর পুরোপুরি দখল করে নেয় পানিহাটা এবং ব্যাপকার্থে বঙ্গদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার, সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন, রূপান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ওপার বাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের ঢল নামে। বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারের প্রদত্ত জমিতে, কিংবা জবরদখলীকৃত জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন কলোনি। সেসময় কলোনির জীবনযাত্রায় ছিল একতা। ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে অধিক গুরুত্ব পেতে শুরু করে সমষ্টির স্বার্থ। শেষ পর্যন্ত কলোনির যে হৃদ সেটাও যৌথ সম্পত্তির আওতায় পড়ে এবং যেকোনো শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন করলেও সেটাকে সমষ্টির সাফল্যের অঙ্গ হিসেবে দেখা হতো। অথচ এখন সেই সংঘবদ্ধতার চেতনা বিলুপ্তির পথে।

> ‘‘পুরোপুরি শহর হয়ে যেতে পানিহাটা ‘মফস্‌সলীয় আবেগ–একতা কোথায় সে উবে গেল। ...তারপর যুগান্তর পেরিয়ে দেশটা ভাঙলে, মফস্‌সল এবং পরিবর্তনের পথ ধরে শহর। বরফ গলে জল, জল থেকে বাষ্প। সেইরকম আর কি! কিন্তু মফস্‌সল কখন শহর হয়? শহর নগরে? লোকে বলে ক্ষমতার তাপাঙ্ক বদলালে! ক্ষমতা! সেই যে মেঘ ভার আকাশ তলে জাহ্নবীর তীরে।’’[৩২]

অর্থাৎ লক্ষ করলে দেখা যায় এই পানিহাটা জনসংখ্যার নিরিখে যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, ঠিক তেমনই—পূর্বের প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ একটা গ্রামীণ পরিবেশ বদলে গিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে মফস্-সলে এবং তা থেকে ক্রমান্বয়ে ইট, কাঠ, পাথর, ফ্লাট বাড়ির শহরে।

অর্থাৎ উপন্যাসের শুরুতেই নৌকায় করে চৈতন্যদেবের আগমনের সঙ্গে একদম শেষের চৈতন্যদেবের আগমন ভিন্ন ধরনের। আমরা দেখতে পাই এ চৈতন্যদেব যেন প্রতীক হিসেবে আসছেন। আর এই প্রতীক চৈতন্যদেবকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে একদল ঘাটে অপেক্ষারত ভক্তরা। তারা ঝকঝকে দুই চাকা, চার চাকায় এসে আকুল অপেক্ষা করছেন। গলায় ঝোলানো খোল-কর্তাল-মৃদঙ্গ। গায়ে গেঞ্জি, প্যান্টালুন সফরি। ভক্তের দল প্রভুকে নিয়ে কীর্তনের তালে তালে সূর্যের আলোহীন ছায়ান্ধকারে পথ ধরে ধরে এগিয়ে চলে। নতুন কোনো দণ্ড মহোৎসবের আয়োজনে। লেখক এই সফরি ড্রেসকে উপন্যাসে একটা Symbol হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ এই চৈতন্য আত্মকেন্দ্রিকবোধের চৈতন্য নয়, এ যেন বিদেশি মূলধনের চৈতন্যকে লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সমগ্র পানিহাটায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে একটা বিশ্বায়নের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। আর এই বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে অনবরত একটা নব্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সংস্কৃতির মধ্যে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এই বৃহৎ সংস্কৃতিতে পরিবেশের কোনো স্থান নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশের সমতা বিনষ্ট করে এখানে তৈরি হয়েছে বড়ো বড়ো বাড়ি, ফ্ল্যাট, বিল্ডিং, নানারকম কারখানা। এই যে Symbolic Transformation বা প্রতীকী রূপান্তর তা লক্ষ করলে দেখা যাবে চৈতন্য আগমনের শুরুতেই যে পরিবেশের বর্ণনাগুলি ছিল তা পরবর্তীকালে পাঁচশো বছরের মধ্যে কীভাবে সেই পরিবেশ ধ্বংস করে বিদেশী অনুপ্রবেশকারী কর্পোরেট পুঁজি। যার ফলে এই পাঁচশো বছরের পানিহাটা রূপান্তরিত হচ্ছে একটা শহরে। পানিহাটার এই যে গ্রামীণ থেকে মফস্সল এবং মফস্সল থেকে শহরে পরিবর্তন, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনকে লেখক পুঁজির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। আমাদের চারপাশের পরিবেশ ধ্বংস করেছে বিদেশী লগ্নিপুঁজি। আর এই পুঁজির চরিত্র বদলে গেছে বলেই তারা জল, জঙ্গল, ভূমিকে নিজেদের অন্তর্গত করে নিচ্ছে, এর ফলে কিন্তু অনবরত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে লেখক বলতে চেয়েছেন—এই বিশ্ব পুঁজি বা বিশ্বায়নের পুঁজি এখন কিন্তু পানিহাটাকে গ্রাস করেছে, তার ফলে সেই প্রকৃতি পরিবেশ আর নেই। অর্থাৎ প্রকৃতি

পরিবেশ পরিবর্তনের পেছনে পুঁজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আলোচ্য পানিহাটা উপন্যাসটিতে। ফলে আজকের পানিহাটায় যে কাল্পনিক শহরের কথা লেখক বলেছেন, সেই শহরের প্রাকৃতিক পরিবর্তনগুলো একটা অদ্ভুত প্রতীকী হিসেবে উঠে এসেছে উপন্যাসে। অর্থাৎ এই পুঁজি নামের চরিত্রটির প্রতিনিধিত্ব করেছেন তথাকথিত চৈতন্যদেব।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'সঞ্চয়িতা', বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৩৮, পৃ. ৬১০-৬১১

২. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১ লা বৈশাখ ১৪১৮, পৃ. ৩৪৫

৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৪৬

৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৪৭

৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৫২

৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৩০-৩৩১

৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৩৫

৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৪০

৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

১০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৫৭

১১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৬-৩৯৭

১২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৪৭-৩৪৮

১৩. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১ লা বৈশাখ ১৪১৮, পৃ. ২১৫

১৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২২

১৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ২১৬

১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪৬

১৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ২১৭

১৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪৮

১৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩৭

২০. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১৮

২১. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯

২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩১

২৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৬

২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৪

২৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪০

২৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৮

২৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৮

২৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫১

২৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫১

৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫২

৩১. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : ‘পানিহাটা’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৪

৩২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮